Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্যসাধক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.4
Pages	81-104
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্যসাধক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

মোঃ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার

১

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মননশীল গদ্যরচনার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে সিরাজগঞ্জের ঘোড়াশাল গ্রামে ২রা মার্চ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আজম আলী এবং মাতার নাম তসিরণ বিবি।[১] বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি সকলের স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি শাহজাদপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯১৬ সালে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯১৮-তে দর্শনে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাস করেন। অতঃপর ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ; ১৯২২ সালে আইন পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৯২৩ সালে ওকালতির সনদ লাভ করেন।[২] এরপর তিনি প্রতিযোগিতামূলক 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস' (বি.সি.এস.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে ইনকামট্যাক্স অফিসার হিসেবে চাকুরীতে যোগ দেন। কিন্তু মানসিক দিক থেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি এ বিভাগ ছেড়ে প্রশাসনে যোগ দেন এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরী-জীবন শুরু করেন।[৩] ১৯৫৩ সালের ৩রা মার্চ তিনি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কিছুদিন বিশেষ কর্মকর্তার (অফিসার-ইন-চার্জ) দায়িত্ব পালন করেন।[৪] ১৯৭৪ সালের ২রা নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।[৫]

উদার ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেও সারা জীবন বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন। সাহিত্যসাধনাই

ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর সাহিত্যে আবেগের সঙ্গে যুক্তির প্রাখর্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আধুনিক কালের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।[৬] এ-ধরনের প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার এবং *নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ* (সঃ) গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬৩-তে পান 'দাউদ সাহিত্য পুরস্কার'। এ-ছাড়া ১৯৬২-তে তিনি 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত হন এবং ১৯৭০-এ 'প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড ফর পারফরমেন্স' পদকে সম্মানিত হন।[৭] একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরে হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মানুষের সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন। আর এ-কারণে মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত গভীর, স্বচ্ছ ও ব্যাপক। সাহিত্য-রচনার বিষয় নির্বাচনে তিনি ছিলেন সর্বদা গুরু ও গম্ভীর। সেই কারণে তাঁর পাঠক সংখ্যাও ছিল সীমিত। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর কদর ছিল অসামান্য। এ কথা সত্য যে প্রতিভার তুলনায় তিনি কম সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ব্যক্তিগতজীবনে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী; আত্মপ্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। বলা যায়, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য এবং সাহিত্যকৃতী ও সাধক হিসেবে তিনি আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে অমর এবং অনুকরণীয় হয়ে থাকবেন।[৮]

২

বাংলা সাহিত্যে বরকতুল্লাহ্ দার্শনিক প্রবন্ধকার হিসেবেই খ্যাতিমান। তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই এই পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। *'পারস্য প্রতিভা'* তাঁর প্রথম গ্রন্থ। ১৯২৪ ও ১৯৩২ সনে এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে 'পারস্য সাহিত্য,' 'কবি ফেরদৌসী,' 'ওমর খইয়াম,' 'শেখ সাদী,' 'কবি হাফিজ,' এবং 'মৌলানা রুমী'র জীবন ও কাব্য আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে 'পারস্যের উর্বর যুগ,' 'ফরিদউদ্দীন আত্তার,' 'নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত,' 'নেযামী,' 'সুফিমত ও বেদান্ত', 'সুফিমত ও নিওপ্লেটোনিজম' প্রভৃতি জটিল দার্শনিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর ১৯৬৫ সালে এই দুই খণ্ড একত্র করে (ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ) মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্ কর্তৃক গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ৩৪ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

পারস্য প্রতিভা গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। কিন্তু প্রবন্ধ-গ্রন্থ হলেও লেখকের পরিবেশনের নৈপুণ্যে তা নিরস গদ্যে পরিণত হয়নি; বরং 'বিশ্লেষণের ভাষা সর্বত্রই

গম্ভীর অথচ মধুর, সারগর্ভ অথচ সরস ও হৃদয়গ্রাহী।''[৯] এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''.....কালে হয়তো এমন দিনও আসিতে পারে যখন বাঙালী পাঠকের নিকট ফেরদৌসী, হাফিজ, সাদী, রুমী এবং ওমর খইয়াম প্রমুখ অমর কবিগণের স্মৃতি হোমার গ্যেটে প্রভৃতি বৈদেশিক কবিদের মতই শুধু নামমাত্রে পর্যবসিত হইবে। *''পারস্য প্রতিভা''* বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো তেমন দিনে পারস্যের মহাকবিগণের পরিচয় জানার পক্ষে রসপিপাসু বঙ্গ ভাষাভাষী পাঠকদের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে এই ভরসায়ই''[১০] তাঁকে এই মহৎ সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৩০ সালে ফাল্গুন সংখ্যা *'বঙ্গবাসী'* পত্রিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়, তা প্রণিধানযোগ্য—

> কার্লাইলের 'হিরোওয়ার্শিবা' প্রভৃতি গন্থে যেরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট, রাস্কিনের গ্রন্থে কারুশিল্প বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতির যেরূপ মনোমদ চিত্র দেদীপ্যমান, এই 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থের গ্রন্থকারেরও সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এক সৌন্দর্যানুভূতির প্রোজ্জ্বল পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার যে একাধারে কবি, ভাবুক এবং জীবনী আলেখ্যের সুপটু চিত্রকর, তাহা এই গ্রন্থে উত্তমরূপেই বুঝা যাইবে। এ পুস্তক একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, আবার-আবার পড়িবার ইচ্ছা হয়। আর কবি ফেরদৌসী প্রভৃতির জীবন-সমালোচনা পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের কবিত্বময়ী আবেগময়ী ছন্দময়ী মধুময়ী ভাষায় আত্মহারা হইয়া মহাপ্রকৃতির কবিত্বকোলে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা জন্মে।[১১]

প্রথম খণ্ডে যেমন পারস্যের কবি ও তাঁদের কাব্যের আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি পারস্যের দার্শনিক-কবি-মনীষীদের জীবন ও মাতদর্শের পরিচয় মেলে। একথা সত্য যে, ধর্ম ও সাহিত্যে জাতিভেদ নেই। স্থান ও কালের বিভিন্নতায় ধর্মে-ধর্মে, সাহিত্যে-সাহিত্যে যে পার্থক্য থাকে, তাতে রসপিপাসু মানুষ বিভিন্নতার রসাস্বাদ করে আনন্দ উপভোগ করেন। *'পারস্য প্রতিভাও'* এরূপ একটি কালজয়ী সৃষ্টি।

'পারস্যের উর্বর যুগ' অংশে পারস্যের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি আলোচনামূলক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁযুগের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সাথে পারস্যের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। একথা ইতিহাসস্বীকৃত সত্য যে, পরাধীনতার যুগে পারস্য ছিল আদেশের দাস। শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের বাইরে কিছু করার সাধ্য তাদের

ছিলনা। কিন্তু জ্ঞানচর্চার ফলে পরবর্তীতে তারা সব কিছুকে আর অন্ধভাবে মেনে নিতে রাজী ছিল না। তাই তারা আরবের যুক্তিবাদী দার্শনিক শিক্ষা, ভারতের উপনিষদের বাণী এবং গ্রীক ও মিশরের নিও-প্লেটোনিক ভাবধারাকে গ্রহণ করে জীবনকে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উন্নত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হলো। ''সে জ্বালিল নীরস সরিয়তের প্রস্তর গৃহে মরমী সুফীবাদের রঞ্জন রশ্মি। কোথা সত্য, কোথা জ্ঞান, কোথা আলো—এই লইয়া পড়িল নবীন পারস্যে এ ক মহাকলরোল।''১২

পারস্য প্রতিভা মূলতঃ পারস্যের কবি সাহিত্যিকদের কাব্যসাহিত্যের আলোচনা। তাঁদের কাব্যের মূল বিষয়বস্তু কি, স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এবং জীবন সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থে। একথা সত্য যে, পারস্যের অধিকাংশ কবি ছিলেন সুফী মতাবলম্বী। আর সুফীদের মূলমন্ত্র হলো নিজেকে চেনা—নিজেকে জানা। বরকতুল্লাহ্ পারস্যের কাব্যকাননের মধ্যে প্রবেশ করে এই মূল সত্য আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। সে প্রয়াস যেমন সৃজনশীলতায় মণ্ডিত, তেমনি কাব্যরসে সমৃদ্ধ। তিনি যদি আর কোন গ্রন্থ রচনা নাও করতেন, তাহলে এই *পারস্য প্রতিভাই* তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখতো। তাঁর সাহিত্যসাধনার ফলেই বাঙালী পাঠক পারস্যের ভুবন বিখ্যাত কবি দার্শনিকের সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থে পারস্যের এগারজন কবি-দার্শনিকের কাব্য-সাহিত্যের এবং মতাদর্শের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—'কবি ফের্দৌসী,' 'ওমর খইয়াম,' 'শেখ সাদী, 'নাসির খসরু;' 'নেযামী,' 'ফরিদউদ্দীন আত্তার,' 'মৌলানা রুমী,' 'কবি হাফিজ,' 'মোল্লা জামী,' 'ইবনে সিনা' ও 'আল গাযযালী।'

'ওমর খইয়াম' পারস্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এখানে লেখক জীবন সম্পর্কে, স্রষ্টা সম্পর্কে ওমরের মতামতের মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের বহু কবি-দার্শনিক মনুষকে নিয়তির হাতের ক্রীড়নক বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই নিয়তি যে কি, সে সম্পর্কে তাঁরা স্থায়ী কোন মীমাংসায় উপনীত হতে পারেন নি। আবার কেউ কেউ এই নিয়তিকে দৈবশক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এই দৈবকে স্বর্গীয় জিনিস বলে মনে করেন। আবার অনেকে এর প্রতিবাদ করে তাঁকে এক অচেতন প্রেরণা বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওমর খইয়াম এইমত স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, সে শক্তি অজ্ঞান বা অচেতন নয়, বরং সদাজাগ্রত। সে যদি অজ্ঞান বা অচেতন হতো তাহলে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে

পারতো না। তিনি মনে করেন, সৃষ্টির এই বিচিত্র সৌন্দর্য সমাবেশ স্রষ্টার নিজের সুখের জন্য। কিন্তু প্রথম জীবনে ওমর এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তিনি জীবনের ক্ষণমুহূর্তকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেছিলেন। আর তাই তিনি পরলোকের অনন্ত সুখলাভের আশায় জীবনের ক্ষণ আনন্দকে বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন না। আবার কোন শাস্ত্রীয় রীতি-নীতিতেও তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। এসব কারণে অনেকে তাঁকে অবিশ্বাসী নাস্তিক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি নাস্তিক ছিলেন কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়না। কেননা তাঁর শেষ জীবনের রুবাইয়াতে স্রষ্টার প্রতি যে একাগ্রতা, যে নিবেদিত চিত্তের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তাতে তাঁকে নাস্তিক বলা যায় না কোন মতেই। হাফিজের মত তিনিও নিজের অন্তরকে সম্বোধন করে বলছেন—

ডরিলে না কভু আখেরী অনল, তৌবা-করিতে শুচি না হলে;
মরণ ঝঞ্ঝা নিভালে দেউটি বসুধা তোমায় লবে কি কোলে।'[১৩]

অথবা,

পাপ হতে খোদা কি ভয় আমার অসীম যে তব করুণাধার,
পথের সম্বল যা দিয়াছ তাতে পথক্লেশ হতে ডরি না আর
তব করুণার-শুভ্র কিরণ সফিদ করয়ে যদি এ কায়,
হোক না বসন কালো-সীয়া মোর, তিলেক শংকা নাহিক তায়।[১৪]

অন্যত্র,

সাধনার মণি যদিও কখনও খুঁজি নাই এ জীবনে,
তব রাহ্পানে মুখ ফিরাইয়া বলি নাই কভু ভুবনে,
তবু তব কৃপাকণিকা হইতে না-উম্মিদ আমি হইনি,
তুমিতো জানো, এককে দুই জীবনে কখনো বলিনি।[১৫]

এ সব রুবাইয়াতে স্রষ্টার প্রতি ওমরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তচিত্তের পরিচয় পরিস্ফুট।

আমরা জানি, মানুষ যতই জীবনের শেষের দিকে অগ্রসর হয়, ততই পরকালের চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে। ওমরের রুবাইয়াতের মধ্যে এই চিন্তার প্রতিধ্বনি উঠেছে একজন মুক্তপ্রাণ সত্যান্বেষীর মর্মস্থল হতে। লেখক ওমরের দার্শনিক চিন্তাভাবনার একটা সুসংবদ্ধ আলোচনা আমাদের সামনে উপস্থিত

করেছেন। তিনি ওমরকে নাস্তিক বলেননি, বরং তিনি যে স্রষ্টার প্রতি একান্তভাবেই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, সেই পরিচয়কেই উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাকে পাওয়ার জন্য মানুষের সকল প্রচেষ্টা ব্যয়িত, ওমর সেই চরম সত্তার সন্ধান করেছেন তাঁর সারাজীবনের সাধনার ভেতর দিয়ে। কিন্তু মিলনের তৃপ্তি কখনও পান নি। তাইতো ওমরের উচ্চারণঃ ''হে খোদা, আমি আমার সীমাবদ্ধ বোধশক্তির সাহায্যে তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব আমার অক্ষমতা ক্ষমা করিও। কারণ আমার যতটুকু জ্ঞান, তোমাকে বুঝিবার জন্য তাহাই আমার সম্বল, উহা ছাড়া অন্য কোন পন্থা আমার ছিলনা।''[১৬]

সৃষ্টির চিররহস্য সম্পর্কে ওমরের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্ব ও তার আদি রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করছেন। তিনি সমস্ত অস্তিত্বকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—একটি আবশ্যিক সত্তা, অন্যটি সম্ভাব্য সত্তা, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুই বুঝায়। ওমরের মতে, যার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, তাই-ই আবশ্যিক সত্তা, অন্যদিকে সম্ভাব্য সত্তার পক্ষে অস্তিত্ব - অনস্তিত্ব দুই-ই সম্ভবপর। আবশ্যিক সত্তার বিনাশ বা ধ্বংস নেই, তা চিরন্তন, কিন্তু সম্ভাব্য সত্তার বেলায় একথা খাটেনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কোন মুসলিম লেখকের বিদেশী কবিদের নিয়ে এমন সুললিত বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।[১৭]

বরকতউল্লাহ্ সেই বিরল প্রশংসার একচ্ছত্র দাবীদার। একটি উদাহরণ দেয়া যাকঃ

> দেখিতে দেখিতে একদিন তাহার জীবনের কৃষ্ণসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ব্যথিতের আর্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাহার জীবনের কুন্দ-কুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল।....শাহানশাহ্ সম্রাট ও দীনহীন প্রজা যে ভবনে একই মূল্য বহন করে, বিশ্বজয়ী সেকেন্দার ও আশ্রয়হীন কাঙাল যেখানে একই সজ্জায় নীত হয়, সেই গৃহ সাধুর জন্য নির্মিত হইল। কিন্তু শেখ সাদীর সন্ধান আজ কোথায় মিলিবে? ছয়মাসের পথ সিরাজ নগরে এ মৃতের আকুল কামনা কবে পৌঁছিবে, কবে সেই প্রতিশ্রুত পথিকের আকাংক্ষিত আগমন সূচিত হইবে?.... সহসা কাহার দূরাগত কণ্ঠের মর্মস্পর্শী বাণী সকলের কর্ণগোচর হইল। দেখা গেল, এক শুক্লাম্বর শ্বেত শ্মশ্রু বিলম্বিত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; মস্তকে শ্বেতোজ্বল শিরস্ত্রাণ, হস্তে রজত-শুভ্র যষ্ঠি, নয়নে স্বর্গের বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপ্রভা। প্রাণের

> উৎসারিত বেদনারাশি জমিয়া যেন তাহার বদনের সৌম্যতাকে অধিকতর নিবিড় করিয়া দিয়াছে। সে তেজঃপুঞ্জ মূর্তি যে দেখিল তাহারই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল ও মস্তক আপনা আপনি তাঁহার পাদমূলে আনত হইয়া আসিল।[১৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, বিষয়নিষ্ঠা, মননশীলতা এবং রচনারীতির বিশিষ্টতা লেখকের ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করে তুলেছে। ''তিনি বক্তব্যকে হৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করেছিলেন বলেই''[১৯] তা আমাদের সহজে আকৃষ্ট করে। বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ও বিষয়ানুগ করার প্রয়োজনে তিনি শব্দনির্বাচনে যথেষ্ট সংযম ও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ''বিদেশী কবি ও কাব্য বিচারে তাঁর ভাষা হয়েছে লোকায়ত ও সুমিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ তিনি আদৌ ব্যবহার করেননি, অথচ তাঁর গদ্যে অলংকার ব্যবহারের অপ্রতুলতা দেখা যায় না।''[২০] তদুপরি ''পারস্য সাহিত্যের ক্লাসিক সৌন্দর্য ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে বরকতুল্লাহ্ এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে পারস্য সাহিত্যের রসও অপরিবর্তিত রয়েছে।''[২১]

এমনিভাবে লেখক পারস্যের এগারো জন কবি দার্শনিকের চিন্তাভাবনার মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

৩

মানুষের ধর্ম বরকতুল্লাহ্‌র অপর শ্রেষ্ঠ রচনা। ''এই উপন্যাস প্লাবিত দেশে এ প্রকার দর্শন বইয়ের পাঠক মিলিবে''[২২] কিনা এই সন্দেহে গ্রন্থটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়। 'অনন্ত তৃষা', ''আদিম প্রেরণা,' ''জীবন ও নীতি,' 'ধ্রুব কোথায়,' 'জড়বাদ,' 'পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ,' 'চৈতন্যবাদ,' 'বস্তুরূপ ও বস্তু,' 'জীবন-প্রবাহ,' 'বিজ্ঞানযুগে ধর্ম ও সভ্যতা,' 'পারমার্থিক জগৎ ও জীবন',--এই এগারোটি প্রবন্ধের সমষ্টি--*মানুষের ধর্ম।* গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে কলকাতায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে ঢাকায় এবং তৃতীয় ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে ঢাকায়।[২৩] ''হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সর্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় ফারসী শব্দের উৎপাত নাই এবং অযথা উচ্ছ্বাসও নাই। ভাষা সর্বত্র সরল; বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য।''[২৪]

তথ্যের প্রাচুর্য পাঠকের বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত করেনি। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট এই যে, লেখক কোথাও সরাসরি তাঁর নিজস্ব ধর্মমতের প্রচার করবার চেষ্টা করেননি। তদুপরি প্রত্যেকটি মতবাদের ব্যাখ্যার মূলে তাঁর আদর্শবাদী মনের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আলোচ্য গ্রন্থে ''বিষয়ের জটিলতাকে ভাষার সরলতা অনেক পরিমাণে অপসারিত করিয়াছে। ভাষা এবং ভাবের''[২৫] এরূপ অপূর্ব সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। গ্রন্থটি বরকতুল্লাহ্‌কে একজন দার্শনিক লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'অনন্ত তৃষা' আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। এখানে লেখক স্রষ্টার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের যে আকূতি, তাকেই 'অনন্ত তৃষা' বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, জীবনে এ তৃষ্ণার নিরসন কখনই হয়না। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে তাঁর অস্তিত্ব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করে মাত্র, কিন্তু তাঁকে পরিপূর্ণ–রূপে পায়না। অন্তরের এই প্রেরণাই মানুষকে নব নব রূপে পৃথিবীতে পরিচিত করায়।

মানুষ চায় নিজেকে প্রকাশ করতে, অনেকের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে, নিজের উপলব্ধ সত্যকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে––মহাকালের বুকে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে। শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুনিচয় নিজেকে প্রকাশের বাসনায় উন্মুখ। মানুষের এই বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা লেখক রূপায়িত করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষের এই বোধকে বিচার করেন নি। বরং ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের আলোকে মানুষের এই অনন্ত বাসনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বেহেস্তের বর্ণনা কেমন ভাবে করা হয়েছে এবং মানুষ তাকে কেমনভাবে গ্রহণ করেছে, তারও একটি নিখুঁত বর্ণনা লেখক এখানে দিয়েছেন। সে বর্ণনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

'অনন্ত তৃষা' একটি দার্শনিক প্রবন্ধ, ভাষা গাম্ভীর্যমণ্ডিত এবং শব্দচয়নে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাই বলে ভাব ভাষার শব্দযোজনার ভারে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেনি। এখানে লেখকের চিন্তার গভীরতা ও নিপুণ বিশ্লেষণশক্তির যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

'আদিম প্রেরণা' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। 'অনন্ত তৃষা'য় লেখক যে প্রেরণার কথা বলেছেন, এখানে তারই বিস্তৃত ব্যাখ্য করেছেন। লেখক প্রতিটি সৃষ্টির–অন্তরে

একটা উন্মাদনা, একটা মোহময় মত্ততা লক্ষ্য করেছেন। কি যেন একটা অজানা আকর্ষণে সৃষ্টি যুগ যুগান্তর ধরে ছুটে চলেছে। আর এর বহিঃপ্রকাশকে মানুষ সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য বলে মনে করে। তিনি মনে করেন, ''এই সচেতন প্রেরণা শুধু সচেতনই নয়, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচালিতও বটে, আর এ থেকেই তিনি অনুমান করেন এর পেছনে কোন উদ্দেশ্যময় চালক রয়েছেন।''[২৬] ''যেন কোন নিপুণ পথবাহী আঁকিয়া-বাঁকিয়া, বন-তরুর-ধারে ধারে, চলা নদীর আঁকে বাঁকে, মুক্ত মাঠের উদাস দীঘল বুকে সৃজনের গান গাহিয়া চলিয়াছে।''[২৭] ''এধরনের একজন চালক আছেন বলেই তো ভবিষ্যৎ চমৎকারভাবে রচিত হচ্ছে বর্তমানের উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে পলে পলে মুছে যাচ্ছে অতীত।''[২৮]

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এই শাশ্বত ''সত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর ভাববাদী আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তির পরিচয়''[২৯] যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ''অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ। কিন্তু তিনি শুধু মাত্র সেই প্রেরণা ও সত্যের কথা বলেই খান্ত হননি, একে অনুধাবন এবং অনুকরণ করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।''[৩০] লেখক একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ''মৎস যেমন পানিতে--জীবনের সার্থকতা অনুভব করে, উদ্ভিদ যেমন আলো ও বাতাসে স্বস্তি অনুভব করে, শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, আত্মাও তেমনি একমাত্র পরমার্থেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ মনে করে।''[৩১] আর এই শাশ্বত সত্যের সাথে একাত্মবোধেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা নিহিত।

'জীবন ও নীতি' একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটিকেও পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের পরিপূরক বলা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক হার্বার্ট স্পেন্সার ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতামতের পুনর্মূল্যায়ন প্রেক্ষিতে মানবজীবনের নীতি নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

লেখক মনে করেন, সত্যকে জীবনের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট করে তোলাই মানবজীবনের মাহাব্রত; আর এই ব্রত উদ্‌যাপনেই জীবনের চরম সুখ নিহিত; তাকে লাভ করবার সাধনাই মনুষের সাধনা। বরকতুল্লাহ্‌র মতে, ''ন্যায় সুনীতি, সৌন্দর্য, কল্যাণ প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানব জীবনের ঐশ্বর্যস্বরূপ। এগুলোর অনুশীলন ও আত্তীকরণেই নিহিত মানুষের স্বকীয়তা ও মহত্ত্ব।''[৩২] বস্তুতঃ ''অনন্ত তৃষা' ''আদিম প্রেরণা' এবং ''জীবন ও নীতি' প্রবন্ধ তিনটির অন্তর্ধর্মে একটা সাজুয্য

খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথক পৃথক ভাবে এগুলোর বিশ্লেষণ করলে মূলের বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা সর্বাধিক।

'ধ্রুব কোথায়?' একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত। সেগুলি হলো--'পূর্বানুবৃত্তি,' 'অশরীরী প্রাণী,' 'ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন,' 'গ্রীসীয় অনুশীলন,' এবং 'প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগৎ'।

আলোচ্য প্রবন্ধের 'পূর্বানুবৃত্তি' অংশে মানব জীবনে সত্যানুসন্ধানের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। এই অংশের মূল কথা হলো, সত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হলে জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন; জ্ঞান ব্যতীত সেই পরম সৌন্দর্যের উপলব্ধি আদৌ সম্ভব নয়। 'অশরীরী প্রাণী অংশে' পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব, অশরীরী প্রাণী স্রষ্টার আসন দখল করে আছে সে সম্পর্কে লেখক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

'ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন' আলোচ্য প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন কিভাবে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেছে, সে বিষয়ে লেখক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। যুক্তির প্রাখর্য জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করলেও ভাষার সাবলীলতা লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে। 'গ্রীসীয় অনুশীলন' অংশে লেখক গ্রীকদের সত্যানুসন্ধানের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'জড়বাদ' প্রবন্ধে লেখক 'জড়ের সৃষ্টি শক্তি,' 'মৌলিক পদার্থ নিয়ে,' 'জড়শক্তির মৌলিকত্ব,' 'জড় হইতে চেতনার উদ্ভব,' এবং 'চৈতন্যের অলীক মাহাত্ম্য,' নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'চৈতন্যবাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ এই জগৎ রহস্যের কিছুই জানতো না। যে যা বলতো তাই অন্ধভাবে মেনে নিতো। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের--নিরসন হয়। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে 'বস্তুরূপ ও বস্তু' প্রবন্ধে। এখানেও লেখক জড় ও চেতনার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, জড় ও চেতনার মধ্যে একটা বস্তুগত সম্পর্ক রয়েছে; এই সম্পর্ক না থাকলে আমরা কিছুই--নুভব করতে পারতাম না। মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জড় কিভাবে কাজ করে যে সম্পর্কেও লেখক এখানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

'জীবন প্রবাহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এখানে লেখক জীবনের মূল উৎস অনুসন্ধানে তৎপর থেকেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু লেখকের মতে, জীবন বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর একটি সত্তা; তা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে চলেনা। আমরা জানি, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সংস্কার আমাদের প্রাত্যহিক জ্ঞানের বাহন। ''কিন্তু এদের সাহায্যে পরম সত্তার সাক্ষাৎজ্ঞান পাওয়া যায়না। এগুলি ছাড়াও মানবমনের জন্য একটি শক্তি আছে; লেখক যার নাম দিয়েছেন 'অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি' বা স্বজ্ঞা।''[৩৩] জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বলতে লেখক মনশ্চক্ষুর উদ্‌ঘাটনকেই বুঝিয়েছেন। যাঁরা আত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাদের মনশ্চক্ষু এমনভাবে খুলে যায় যে, তাঁদের সকল কাল বর্তমানে পরিণত হয়, সকল রহস্যের জট খুলে যায়।

'পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ' প্রবন্ধে লেখক পরমাণুরহস্য, পরমাণুর তেজোময় শক্তিরূপ, আলোক ও সৌরজাগতিক রশ্মিসমূহের দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি এবং প্রাণশক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর মতবাদের পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে ''আমরা জড় জগতের পশ্চাতে যে বিরাট চেতনা শক্তির সাক্ষাৎ পাইতেছি, এই বিশ্ব হয়ত বস্তুরূপে সেই চেতনা শক্তিরই মূর্তপ্রকাশ।'[৩৪] কিন্তু এই বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত রহস্য সম্পর্কে লেখকের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তার মীমাংসা ''কিয়ামতের পূর্ব্বে--মলিবে বলিয়া মনে হয়না।''[৩৫] কারণ লেখকের মতে, ''মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধি এখানে ঝিমাইয়া আসে, বিজ্ঞানের ক্লান্ত পাখা আপনি গুটাইয়া আসে।'[৩৬]

'বিজ্ঞানযুগে ধর্ম ও সভ্যতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নাস্তিকতার প্রসার, কালমার্কস ও নয়া সমাজ বিধান, যান্ত্রিক সভ্যতা ও উহার প্রতিক্রিয়া ও সভ্যতাকে সম্ভাব্য ধ্বংস হইতে রক্ষা কিসে সম্ভব। লেখক মনে করেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের মনে নাস্তিকতার জন্ম দিয়েছে। ফলে সূর্য এবং অনন্ত মহাবিশ্বের গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে মানুষের পূর্বের ধারণায় ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই সে ইহকালকেই তার সকল হিসাব নিকাশের শেষ বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। নৈতিক অধঃপতনই এর একমাত্র কারণ বলে লেখকের ধারণা। ''যে জাতি দেহের ক্ষুধা মিটানোর জন্য কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, তাহারা আত্মার ক্ষুধা বিস্মৃত হয় এবং মানবতার সেখানে ঘটে মৃত্যু।''[৩৭]

'পারমার্থিক জগৎ ও জীবন'' আলোচ্য গ্রন্থের শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারীর সাথে মানবমনের প্রেম কি কল্পনা বিলাস মাত্র? জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক, আত্মার বিনাশ আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত করেছেন।

লেখক মনে করেন, বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় যোগ রয়েছে। মহাপুরুষরা যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, তা শুধু সেই মহাপরাক্রমশালীর সঙ্গে প্রেমের নিবিড়তার কারণে। তাই ধর্মকে তিনি ''হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের''[৩৮] মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। ''বুদ্ধির সাহায্যে জড়জগতে যদি উহার সমর্থনে প্রমাণ কিছু নাই দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ইহা মনে করা সঙ্গত হইবেনা যে, ধর্মীয় বিশ্বাস নিছক কল্পনা ভিত্তিক বা নিরর্থক।''[৩৯] এই প্রসঙ্গে লেখক জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক এবং আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

সুতরাং *'মানুষের ধর্ম'* গ্রন্থে লেখক বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের জটাজাল উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। একজন সত্যসন্ধানীর ন্যায় তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মন নিয়ে তিনি একাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তবুও বলতে হয়, ''যোগীর কৃচ্ছ্রসাধন অপেক্ষা সুফীর ভাবসাধনার দিকে লেখকের মনের প্রবণতা অধিক। কিন্তু আত্মার রহস্যতল উন্মুক্ত সম্পর্কে ভাবানুভূতির প্রাধান্য যত আবেগাতিশয্যের সঙ্গেই ঘোষিত হউকনা কেন, আজ যে-- অধ্যাত্মবাদীরা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের সহায়তা গ্রহণ করিতে নিয়ত ব্যগ্র, তাহাতেই প্রতিপাদিত হয় যে, অপরোক্ষানুভূতি অপেক্ষা কাণ্ডজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার প্রাধান্য ও ব্যাপকতর প্রয়োজনীয়তা।''[৪০]

৪

মানুষের ধর্ম (১৯৩৪) গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই বরকতুল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মে কেমন যেন ভাটা পড়ে এসেছিল। প্রায় তেইশ বছরকাল তিনি একপ্রকার সাহিত্যিক নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালে তাঁর *কারবালা* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্য সাধনার এক নতুন পর্বের উন্মেষ ঘটল। *পারস্য প্রতিভা* ও *মানুষের ধর্ম'* গ্রন্থদ্বয়ের সৃষ্টিপর্বে বরকতুল্লার মুখ্য ভূমিকা ছিল সাহিত্য-সমালোচক ও

দার্শনিকের। আলোচ্য পর্বে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন ইতিহাসের ভাষ্যকার রূপে।[৪১] ১৯৬৫ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ''ইমাম হাসান এবং হুসায়েনের অন্যায় নিধন, কারবালার মর্মন্তুদ-হত্যাকাহিনী, এবং ঈমাম বংশীয়দের পরবর্তী বিষাদময় পরিণাম সম্বন্ধে''[৪২] আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে এ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সে সব গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। কারবালা সংক্রান্ত জনপ্রিয় রচনা মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু*-তে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ পীড়াদায়ক। সেদিক থেকে বরকতুল্লাহ্‌র *কারবালা* ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। জনৈক সমালোচক বলেছেন, ''বাংলা সাহিত্যে কারবালার করুণ কাহিনীর অবলম্বনে এ যাবৎ যত বই প্রকাশিত হয়েছে, সে সবের একখানাতেও সম্ভবতঃ আলোচ্য বইয়ের মত সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই''[৪৩] উচ্ছ্বাসহীন সত্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক সত্য বর্ণনার মন নিয়ে তিনি কারবালার সঠিক তথ্য নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও সাবলীল।

নবীজীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থরচনা বরকতুল্লাহ্‌র আর একটি মহৎ কীর্তি। এসব রচনার মধ্যে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *নবীগৃহ সংবাদ(মক্কা খণ্ড)* এবং ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ(সঃ)' [৩৭] উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এদু'টি গ্রন্থ এক মহাজীবনেরই দুটি অধ্যায়। প্রথম গ্রন্থে নবীর মক্কা জীবন এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে মদীনা জীবনের তথ্যবহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম গ্রন্থে নবীর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের প্রথম দিনগুলির কথা, বিবি খাদিজার সঙ্গে তার শুভপরিণয়, ধর্মসাধনার স্বরূপ, ইসলামের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে নবীর মদীনায় হিযরতের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিচিত্র কর্মময় জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হযেছে। জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে নবীকে আমরা একজন আদর্শ গৃহী, ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ ধর্মসাধক এবং নিরীহ ভাল মানুষ হিসেবে পাই; পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে আমরা বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মহামানবরূপে লক্ষ্য করি। এই পর্বে তিনি একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, সমাজ সংগঠক, দরদী জননেতা, সুকৌশলী যোদ্ধা, প্রজারঞ্জক শাসক, স্নেহশীল পিতা, প্রেমময় স্বামী এবং মানবকল্যাণে নিয়োজিত নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। মূলতঃ এই দু'য়ে মিলিয়েই নবীজীবনের পরিপূর্ণতা। আলোচনার সুবিধার্থে 'নবীগৃহ সংবাদ' গ্রন্থটিকে নবীজীবনের প্রথম পর্বরূপে চিহ্নিত করে লেখকের সাফল্যের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

নবীগৃহ সংবাদ এ নবীর বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের কথা থাকলেও মূলতঃ তাঁর পারিবারিক জীবনের একটি অতি মূল্যবান অধ্যায়ের কথা এখানে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এই পর্বে বিবি খাদিজাকে দেখা যায় নবী জীবনের একটা প্রচণ্ড নিয়ামক শক্তি রূপে। এখানে লেখক খাদিজার চরিত্র মাহাত্ম্য, স্বামীভক্তি, আদর্শ – নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি ইসলামের উন্মেষ ও বিকাশে তাঁর অবদানের কথা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন মক্কার আর্থ-সামাজিক জীবনের চিত্রও এখানে অনুপস্থিত নয়। বলা বাহুল্য, খাদিজা এখানে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব-- যিনি নবীর ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মহানবী (সঃ) নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে জীবনের পথে চলতে চলতে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অপরূপ চরিত্র মাধুর্যগুণে কিভাবে মানুষের শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন, কিভাবে খাদিজার সঙ্গে তার শুভ পরিণয় ঘটেছিল এবং কিভাবে খাদিজার সাহচর্যে মহাজীবনের পথ রচনা হলো, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তা সরস গল্পের মত করে বর্ণনা করেছেন। লেখক খাদিজার পতিভক্তি ও আদর্শনিষ্ঠার ''যে অনাড়ম্বর অথচ সাবলীল বর্ননা দিয়েছেন, তা সহজেই ইসলামভক্ত পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগায়''[৪৪] সন্দেহ নেই। মুহাম্মদচরিত্র এখানে কিছুটা অন্তঃশীলা। নবীজীবনের এই পর্বে তাই কোন চমৎকারিত্ব নেই।

সুতরাং *নবীগৃহ সংবাদ* মুহাম্মদ-জীবনের মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে যে নিরাসক্ত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন এখানে তার বড়ই অভাব। বরং ভাবাবেগ এবং আতিশয্যই প্রাধান্য লাভ করেছে সে তুলনায় বেশি। এ গ্রন্থের আবেদন তাই যতটা না বুদ্ধির কাছে, তার চেয়ে বেশি হৃদয়ের কাছে। এখানে যে বরকতুল্লাহ্‌কে আমরা পাই, তিনি চিন্তাশীল মনীষী বটেন, কিন্তু ভাবের আবেগই তাঁর বক্তব্যকে মধুর করে তুলেছে। তদুপরি ভাষা ভঙ্গীতেও লেখক খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। সাধারণ মানুষের দাবী মেটাতে গিয়ে তিনি এখানে সহজবোধ্য গদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ''কিন্তু যে সাফল্যের আশায় তিনি এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, এই গদ্যভঙ্গী তা তাঁকে দিতে পারেনি। ফলে গ্রন্থটি শৈল্পিক সমুন্নতিলাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর গদ্যভঙ্গী এখানে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।''[৪৫]

নবীজীবনীসংক্রান্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ।* নবীজীবনের এই পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত নবীজীবনের সর্বাত্মক মহিমময় বিকাশের এই

পর্ব দশবছর সময় সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও তা ব্যাপক, গভীর ও দূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে। নিছক ঘটনা, কর্ম ও অভিজ্ঞতার পরিধি বিচারেও নবীজীবনের এ পর্বটি তুলনাহীন। এ পর্ব লেখকের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও সাধনার ফসল। এ গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব হিসেবে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে মালমশলা সংগ্রহ করেছেন।[৪৬] তবুও তিনি নবীজীবন সম্পর্কে সবকিছু বলতে পেরেছেন এ দাবী করেন নি। প্রচুর জ্ঞান ও মননশক্তি থাকা সত্ত্বেও নবীজীবনের বহু ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি কিছুটা অলৌকিকত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন সত্য কিন্তু কোথাও যুক্তি বিচারের পথ পরিহার করেননি। আমরা জানি, বরকতুল্লাহ্ পেশায় ছিলেন একজন বিচারক। তাই বিচারকের নৈয়ায়িক মনীষার প্রতিফলন তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থ রচনায়ও তিনি প্রধানতঃ যুক্তি এবং তথ্যের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু ''যেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা যুক্তিকে জোরালো করতে পারেনি, সেখানে তিনি নবীর বহির্জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে তাঁর অন্তর্জীবনের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে বক্তব্যের সমর্থন খুঁজেছেন।''[৪৭] ফলে বরকতুল্লাহ্ ''বস্তুবাদী গবেষক হিসেবে যেখানে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, সেখানে দার্শনিকের বস্তু অতিক্রমী ভাবনার পথ ধরে অবলীলায় অলৌকিকতাকেও যুক্তি পরিমণ্ডলে টেনে এনে''[৪৮] বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আঠারটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থে লেখক মহানবীর হিযরতের সময় থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের সকল ঘটনার বর্ণনা করেছেন। মক্কা জীবনে যিনি ছিলেন একজন নিরীহ ধর্মসাধক, এখানে তিনি সুনিপুণ যোদ্ধা, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, আদর্শ শাসক হিসেবে প্রতিভাত হযেছেন। মহানবী (সঃ) যে একজন আদর্শ ধর্মসাধকমাত্র ছিলেন না, বরং পার্থিব জীবনের নানা সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন একজন প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তা যুক্তিসহকারে আলোচনা করেছেন। একথা সত্য যে, নবীজীবনী রচনার ক্ষেত্রে বরকতুল্লাহ্ -ই পথিকৃৎ নন। তাঁর পূর্বে ও পরে অনেকেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তবে তার মধ্যে শেখ আব্দুর রহিমের *হযরত মুহম্মদের জীবনী ও রাষ্ট্রনীতি*, মাওলানা আকরম খাঁর *মোস্তফা চরিত*, এবং গোলাম মোস্তফার *বিশ্বনবী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ আব্দুর রহিমের গ্রন্থে ''গবেষকের নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও তথ্যগত ভ্রান্তি যেমন আছে, তেমনি আছে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর ভক্তি ও বিশ্বাসের আধিপত্য। *মোস্তফা চরিত* ভ্রান্তিমুক্ত না হলেও এতে আধুনিক মনোভঙ্গীসুলভ যুক্তি বিচারের

প্রয়াস রয়েছে। গোলাম মোস্তফার *বিশ্বনবী* নবীজীবনী সংক্রান্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ। গবেষণা সুলভ তথ্যনিষ্ঠা সত্ত্বেও এ-গ্রন্থে ধর্মাবেগের আধিক্য ঘটায় স্বাধীন বিচার শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।''[৪৯] এক্ষেত্রে এয়াকুব আলী চৌধুরীর *মানব মুকুট* গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গ্রন্থটির সর্বত্র পরিচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি মুহম্মদকে অলৌকিকতা মুক্ত করে একজন খাঁটি সামাজিক মানুষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

অন্যদিকে *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (সঃ) গ্রন্থটি বরকতুল্লাহ্ তাঁর বিশেষ কালের সংগঠনকামী মুসলিম সমাজের কাছে একটি দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন লিখেছিলেন বলে মনে হয়।''[৫০] ফলে গ্রন্থটিতে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। তবুও বলতে হয়, মাওলানা আকরম খাঁ ও এয়াকুব আলী চৌধুরীর মত তিনি নিরাসক্ত স্বাধীন বিচারশক্তির পরিচয় সর্বত্র দেখাতে পারেননি। তদুপরি ''ভাষার যে ইন্দ্রজাল তিনি *'পারস্য প্রতিভা'* ও *'মানুসের ধর্ম'* গ্রন্থে সৃষ্টি করেছেন, এখানে তার বড়ই অভাব। মনে হয় বিপুল মালমশলা কাজে লাগাতো গিয়ে বুদ্ধির যে সতর্কতার প্রয়োজন তা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। এক ধরনের শৈথিল্য ভাষার শিল্পকর্মে প্রতিফলিত।''[৫১] ফলে এখানে তিনি দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (সঃ) একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সন্দেহ নেই। ত্রিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল ''এ গ্রন্থ তাঁকে নাইবা দিল শিল্পীর খ্যাতি; তিনি যে এত দীর্ঘদিন ধরে এক মহাজীবনের রহস্যানুধাবনের সাধনা করেছেন''[৫২] তা তাঁকে একজন উঁচু দরের সংস্কৃতিমনা সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ''তাঁর চোখের সামনে যে নয়াজাতি নবজীনের উদ্বোধনের আয়োজন চলেছিল, সে আয়োজনে নিজের অবদান যোগাতে গিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন *নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (সঃ)।''[৫৩] বৃটিশ ভারতের নিগৃহীত, অবহেলিত মুসলমানদের সামনে নবজীবনের আদর্শ তুলে ধরে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

হযরত উসমান সম্ভবতঃ বরকতুল্লাহ্‌র সর্বশেষ রচনা। পাঁচটি অধ্যায় এবং দুইশত বাইশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত আলোচ্য গ্রন্থে লেখক হযরত উসমানের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর শাহাদৎ বরণ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) ঘনিষ্ঠ সহচরদের মধ্যে হযরত উসমান ছিলেন অন্যতম একজন। তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র মুসলিম

বিশ্বের বিশেষ করে আরব সমাজের নৈতিক অবনতি হতে শুরু করে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ হতে তারা ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে। প্রাথমিক যুগের ইসলামের মহান সেবকদের মৃত্যুর পর তাঁদের বংশধরেরা ইসলামের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতে উঠে। ফলে মুসলিম সমাজে আত্মকলহ ও হৃদয়হীনতা চরমে পৌঁছে। এই রূপ পরিস্থিতিতে হযরত উসমান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তদুপরি শাসকবর্গের অহমিকা ও পক্ষপাতিত্ব জনগণের ভেতর যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, খলিফার নিকট তার যথোপযুক্ত প্রতিকার না পেয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ফলে হযরত উসমানকে ''ফরাসী-বিপ্লবের ভাগ্য বিড়ম্বিত সম্রাট ষোড়শ লুইর মত''[৫৫] বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বহুল অংশ হাসপাতালে তাঁর স্ত্রীর রোগ শিয়রে বসে লেখা। ''তাই একান্ত ঘটনা প্রবাহেই তাঁহার শোক স্মৃতি এই গ্রন্থের সহিত জড়িত হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর শেষ পরিণতিও অত্যন্ত শোকাবহ ও করুণ। তেমনি ইহার রচনার পরিসমাপ্তি হয় এক বেদনার বালুচরে।''[৫৬] লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়ে উসমানের চরিত্র অংকন করেছেন। এ-গ্রন্থ রচনায়ও লেখক দেশী-বিদেশী উপাদান কাজে লাগিয়ে গ্রন্থটি তথ্যনিষ্ঠ করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য লেখকের সে প্রয়াস আশ্চর্য সফলতায় দীপ্যমান। একদা দানে মুক্তহস্ত, হৃদয়ের মহত্বে ইতিহাসে স্মরণীয়, নবীর প্রিয় জামাতা হযরত উসমানের শাহাদৎ বরণের ঘটনার বর্ণনায় লেখকের ভাষাও হয়েছে পরিবেশানুগ। ''তাহারা খলিফার অন্তরে ঢুকিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার অরক্ষিত দুর্বল দেহের উপর তরবারির আঘাত হানিতে লাগিল। তখনও তিনি স্থিরভাবে উপবিষ্ট এবং পবিত্র কুরআন, যাহা তিনি ইতিপূর্বে পাঠরত ছিলেন, তখনও তাঁহার দুই হাঁটুর উপর উন্মেলিত।....আঘাত আঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ধারা ঝরিতে লাগিল।...তাঁহার দেহ-নিঃসৃত শোণিতে কুরআনের শুভ্র পাতাগুলি সিক্ত ও রঞ্জিত হইয়া গেল।''[৫৭]

৫

এবার বরকতুল্লাহ্‌র ভাষাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করে আলোচ্য প্রবন্ধের সমাপ্তি টানবো। একথা সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে বরকতুল্লাহ্ কোন বিশিষ্ট ভাষাশৈলীর

প্রবর্তক নন। তবে তিনি বাংলা গদ্যভাষার একজন কুশলী শিল্পী এবং স্বকীয়তায় দীপ্যমান। বিদ্যাসাগর–বঙ্কিম–রবীন্দ্রনাথ–প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদের যে পথ নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে অনেক লেখকের পদচারণায় তার যথেষ্ট প্রসার ও পরিশীলন ঘটেছিল। বরকতুল্লাহ্ এই বহুচচির্ত ক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর *পারস্য প্রতিভা–য়* এই ভাষাভঙ্গী চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। পরবর্তীকালে *মানুষের ধর্ম*–এও এই রীতি তিনি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ভাষার এই কারুকাজ আর লক্ষ্যকরা যায়না। সম্ভবতঃ পরিণত বয়সে ''পরিবর্তিত মানসধর্মের তাগিদে তিনি সাহিত্য ও দর্শনের স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় জাতীয় জীবন মহিমার স্বরূপ অন্বেষায় প্রবৃত্ত হন।''[৫৮] ফলে একথা নির্মম হলেও সত্য যে, তাঁর ভাষা শিল্পশ্রীবর্জিত। বস্তুতঃ *কারবালা, নবীগৃহ সংবাদ নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (সঃ), *হযরত উসমান* গ্রন্থসমূহে সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ্ যেমন নাযুক, ভাষা শিল্পী বরকতুল্লাহ্ তেমনি নিস্প্রভ।''[৫৯]

একথা সত্য যে, *পারস্য প্রতিভাই* বরকতুল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি; আর এই গ্রন্থই তাঁর ভাষাশৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ গ্রন্থে ভাষা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বিচিত্র ভঙ্গিম হয়ে উঠেছে। ''দর্শনতত্ত্বেরও গূঢ়রহস্য ব্যাখ্যায় তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে ধীরগতি, গম্ভীর, অনুসন্ধিৎসু এবং অন্তঃশিলা''।[৬০] ''কেউ কেউ এ ভাষায় প্রত্যক্ষ করেছেন কার্লাইলের রচনার মত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও রাস্কিনের ন্যায় কারুশিল্প বিশ্লেষণের নৈপুণ্য।''[৬১] *যেমন :*

> মানুষের বেলাই শুধু আত্মবোধ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আদি চৈতন্যে উহা আরোপিত হইতে পারে না। যে অন্ধকারে কিছু দেখিতেছে না তার জন্য আলোর প্রয়োজন। কিন্তু আলোক নিজে অপর কোন আলোকের প্রতীক্ষ নহে। মানুষের ইচ্ছার মত তাহার কোন (অভাব প্রণোদিত) ইচ্ছা শক্তি নাই। কারণ তিনি কিছুর প্রত্যাশী নহেন; তাহার বাঞ্জনীয় কিছুই থাকিতে পারে না।... তিনি অভাবশূন্য, আকাঙক্ষা–শূন্য; ...যে গুণই তাহাতে আরোপ করা যায়, তাহাই তাঁহাকে সীমার মধ্যে আনে।
>
> [*পারস্য প্রতিভা:* সুফীমত ও নিও–প্লেটোনিজম, পৃ.৭৯]

এখানে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফলে ভাষা নিরাবেগ, ধীরগতি এবং গম্ভীর। আবার—

> কবি স্নানাগার হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার কার্যের পুরস্কার তথায় পৌঁছিল। উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সাগ্রহে পুরস্কারের প্রতিদৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু একি! এতো ষষ্টি সহস্র শ্লাকের প্রতিশ্রুত ষষ্টি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নহে, এযে রৌপ্য মুদ্রা। ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে মুহূর্তের জন্য কবি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।...গভীর অবজ্ঞার সহিত তিনি ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যাখ্যান করিলেন।
>
> [*পারস্য প্রতিভা*, কবি ফেরদৌসী, পৃ. ১১৫]

এখানে ঘটনার নাটকীয় বিকাশে ভাষা উচ্চকিত, গতিময় এবং দ্রুত স্পন্দনশীল হয়ে উঠেছে। আবার—

> পথ সর্বত্র বন্ধুর কংকরময় কোথাও উচ্চ গিরিরাজির ভিতর দিয়া, কোথাও দৃষ্টি অপরোধী অরণ্যশ্রেণীভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথা দূর প্রসারিত শস্যবিস্তীর্ণ হরিৎভূমি, অথবা সবশীর্ষে শোভিত দীর্ঘ উপত্যকা। কোথাও আবার তরঙ্গভঙ্গময় মরুভূমির অগ্নিকণা উদ্ভাসিত করাল মূর্তি।...একদিকে লজ্জাশীলা কুজ্ঝটিকা পর্বত গুহায় আত্মগোপন করিতেছে।''
>
> [*পারস্য প্রতিভা*, ঐ, পৃ. ১১৯]

এখানে বিশ্বপ্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনায় ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্যময় এবং চিত্তহারী। *পারস্য প্রতিভা*-য়-ভাষার এই ধরনের শিল্পগুণ প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয়।

মানুষের ধর্ম গ্রন্থের ভাষা ''স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসমুক্ত; কিন্তু জটিল নয়, বরং প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য'[৬২] বাস্তব জীবন থেকে উপমা সংগ্রহ করে তিনি বক্তব্যকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, যেখানেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই হৃদয়ানুভূতির উত্তাপ সঞ্চারিত করেছেন। যেমন—

> ১. একই বিদ্যুৎ প্রবাহ যেমন নগরীর লক্ষ প্রদীপের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, তেমনি একই মহা প্রেরণা সহস্র মানবসমষ্টির ভিতর দিয়া কোন এক দূর লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।
>
> •
>
> ২. প্রকৃতি চায় অবাধ নৃত্য, অবাধ লীলা, অসংক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি। কিশোরীর দেহে রূপ আর ধরেনা— কূলে কূলে যৌবন উছলিয়া পড়ি-তেছে। উদ্দাম লালসা অঙ্গে অঙ্গেশিহরণ দিয়েছে, প্রকৃতি আপনার আভরণ দিয়া আজ তাহাকে ভূষিত করিতেছে—তোমার

দেওয়া আভরণের সে প্রত্যাশা রাখেনা,কেননা, আজ সে ঐ তরুণীকে মাতৃত্বের গৌরবময় সিংহাসনে বসাইতে যাইতেছে।

৩. রূপকের মোহ ঘুচিলেই মানুষ বিস্ময়ে দেখিবে, একদিন যাহাকে সে চৈতন্য বলিয়া পূজা দিয়াছে, সে জড়েরই একটা সাময়িক রূপান্তর মাত্র।মায়াবী জড়ই চৈতন্যরূপে হাসিতেছে। তাহাকেই এতদিন মানুষ কত দাক্ষিণ্যের অবতার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে।

উপরি-উক্ত তিনটি দৃষ্টান্তই দেখা যাচ্ছে লেখক জড় জগৎ ও মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহারহস্যময় এক সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। নিগূঢ় দার্শনিকতত্ত্ব তাঁর ভাষার গুণে আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। মানুষের ধর্ম গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই এ ভাষার ঝংকার শোনা যায়।

অতঃপর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তিনি, যথাক্রমে কারবালা *নবীগৃহ সংবাদ নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* ও *হযরত উসমান*—এই চারটি গ্রন্থ রচনা করে এক নূতন পর্বের অবতারণা করেন। এ পর্বে তিনি ''সাতিহ্য ও দর্শনের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় মুসলিম জীবনের মর্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বস্তুতঃ এখন থেকে তাঁর রচনায় শিল্পীর ভূমিকা গৌণ হয়ে দেখা দিল।''[৬৩] যে নতুন ক্ষেত্রে তিনি পদচারণা শুরু করলেন সেখানে চিন্তাভাবনার অবকাশ খুব বেশি একটা নেই; কল্পনার পথ তো একবারেই রুদ্ধ। এখানে বরকতুল্লাহ্ সাধুভাষার ঐশ্বর্যময় পথ থেকে সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল; সরল গদ্য রচনার নতুন পথ সন্ধানে ব্রতী হয়ে স্বীয় শিল্প সার্থকতার সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তুললেন। ফলে না পারলেন তিনি সাধুগদ্যরীতির প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাতে, না পারলেন ''সত্যিকার প্রাঞ্জল, সুন্দর সাহিত্য গুলোতে নতুন গদ্যভঙ্গী সৃষ্টি করতে।''[৬৪] আর সেই কারণে তাঁর শেষপর্বের রচনাগুলি প্রায়শঃই শিল্পশ্রীবর্জিত। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক:

১. ত্রিশ বছর আগে এই পবিত্র আসনে তাহাদের প্রভু বসিতেন, এই স্মৃতি শিয়াদিগকে উদ্বেলিত করিল। হাজার হাজার লোক ভক্তি গদগদ চিত্তে কলেমা শাহাদাৎ পড়িতে পড়িতে উহার অনুগমন করিল। সৈন্যগণের মনে তখন এমনই হিম্মৎ ও বীর্যের সঞ্চার হইল যে, আহাদের মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন সাত হাজার নয়, সাত লক্ষ এবং পৃথিবী জয়ে সমর্থ।

[*কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৫৫]

২. ক্ষণপরে সবিস্ময়ে দেখিলেন, দূর দিগন্তে আবার সেই মহিমান্বিত জ্যোতির আবির্ভাব। যে আকাশের প্রাচীর বহিয়া নূরের ঝলক ঠিকরিয়া পড়িতেছে। কি অপরূপ সে দৃশ্য। নবীর মন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোল খাইতে লাগিল। একি সত্য! না মানসিক বিভ্রান্তি? অকূল বিস্ময়ে হযরত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

[*নবীগৃহ সংবাদ*, পৃ. ১৩৮]

৩. যোগ্য শিষ্য-শিষ্যা পাইলে গুরুর মানসিকতাও খেলে ভাল। তাঁহার অন্তরের বিশালতা প্রতিফলিত করার পক্ষে ইহাদের ভিতর তিনি পান উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিশাল সূর্যের প্রতিবিম্ব শিশির কণাতেও ধরাপড়ে, কিন্তু উহা কিরণ দেয় না।...উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন এক একটি জ্যোতিষ্ক, যাহাদের উপর নবীরূপ মহাসূর্যের কিরণ পড়িয়াছিল।

[*নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ*, পৃ. ১৭৯]

৪. আহত অভিমানে খলিফার ভিতরকার সুপ্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পদোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, ''মৃত্যুই আমি শ্রেয় মনে করি, ভয়ে পদত্যাগ অপেক্ষা।''

[*হযরত উসমান*, পৃ. ১৯৭]

উদ্ধৃতিগুলো একটু সচেতনভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে, এখানে পূর্ববর্তী ভাষারীতির ছায়াপাত ঘটলেও ভাষায় তেমন ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়না। সাধারণ মানুষের দাবী মেটাতে গিয়ে তিনি সরল গদ্য রচনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গদ্যরীতির মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। ''জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তথ্যানুগামিতার বিশেষ দায় রয়েছে বলেই হয়ত লেখক এসব ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন।''[৬৫] তাঁর এ পর্বের কোন রচনাই *পারস্য প্রতিভা* এবং *মানুষের ধর্ম*-এর মত শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেনি। শব্দ চয়নে যেমন, পরিবেশন নৈপুণ্যেও তেমনি তিনি উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পারেননি—এ কথা নির্মম হলেও সত্য।

তথ্যনির্দেশ

১. গোলাম সাক্‌লায়েন, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌*, ১ম প্রকাশঃ ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৯
২. প্রাগুক্ত,
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৪. প্রাগুক্ত,
৫. প্রাগুক্ত,
৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), ৪র্থ সংস্করণ ১৩৮১, প্রকাশকঃ নাসিম বানু ঢাকা, পৃ. ২১০
৭. গোলাম সাক্‌লায়েন, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৮. *দৈনিক বাংলার* বাণী, সম্পাদকীয়, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৮১
৯. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌, *পারস্যপ্রতিভা*, মুখবন্ধ, ৬ষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৫, প্রকাশকঃ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্‌, ঢাকা।
১০. প্রাগুক্ত, মুখবন্ধ,
১১. প্রগুক্ত, পরিশিষ্ট অংশের সমালোচনা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮ মূল ফারসীঃ

''আয আতশে আখেরাত নসীদারী বাক/ দর আবে নাদাসত না শুদী হরগেয পাক;
চুন বাদে আজল্‌ চেরাগে ওমরাত বো' জোশাদ। তরসাম্‌ কে তুরা যে নানগ না পযিরাদ খাজ।''

১৪. প্রোগুক্ত, পৃ. ১৫৯।মূল ফারসী

ব" রহ্‌মতে তু মান্‌ আয গোনাহ্‌ না আন্দেশম্‌
ব'তোযায়ে তু যে রঙ্গে রাহ না আন্দেশম্‌
গর্‌ লুৎফে তু মায় সুফিদ-রু কর্‌, দায়ান্দ
ইয়াজ্‌ যারা যে জামায়ে সীয়া না আন্দেশম্‌।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
মূল ফারসীঃ

গর্‌ গওহরে তা'তাত না সিফ্‌তাম হরগেয
ওয়ার গিরদে রাহাত যে রুখ না রাফতাম হরগেয
না-উন্মিদ নায়েম যে বারগাহে জারামাত
দানী কে ইয়াকে রা দো না গোফ্‌তাম্‌ হরগেয।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫। Immediately before his death, he was reading in the "*shifa*"of abicenna-the chaptar treating of the one and the Many, and his last words were:-

> O god , verily I have striven to know Thee according to the range of my powers, theretore forgive me; for, indeed such know ledge of Thee as I possess is my (only) means of approach to Thee,"—Literary History of perjia, by E.g. Browne, P-25.

১৭. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৮. মোহম্মদ বরকতউল্লাহ্, *পারস্য প্রতিভা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১

১৯. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

২২. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, *মানুষের ধর্ম*, ২য় সংস্করণ ১৯৫০, ঢাকা, প্রকাশক, মোঃ আমানুল্লাহ্, 'লেখকের কথা' দ্রষ্টব্য।

২৩. গোলাম সাক্‌লায়েন, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮.

২৪. ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা '*প্রবাসী* পত্রিকার সমালোচনা থেকে।

২৫. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, *মানুষের ধর্ম*, ৩য় ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৫৯, ঢাকা, প্রকাশকঃ মোঃ আমানুল্লাহ্, ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

২৬. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৭. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, *মানুষের ধর্ম*,

২৮. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৯. গোলাম সাক্‌লায়নে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩০. প্রাগুক্ত,

৩১. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, *মানুষের ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩২. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩৪. মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্, *মানুষের ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৬. প্রাগুক্ত,

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৩৯. প্রাগুক্ত,

৪০. *সবুজ বাংলা*, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৪১, আবদুল কাদির কর্তৃক '*বরকতউল্লাহ্*' সম্পর্কিত সমালোচনা থেকে।
৪১. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৪৩. গোলাম সাক্‌লায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
৪৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, নবীজীবনী রচয়িতা বরকতুল্লাহ্, *মাসিক পূর্বাচল*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৮৫, ঢাকা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: কে. জি, মোস্তফা, পৃ. ২
৪৫. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪৬. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪৭. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৮. প্রাগুক্ত,
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৫০. প্রাগুক্ত,
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৫২. প্রগুক্ত
৫৩. প্রাগুক্ত,
৫৪. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্, *হযরত উসমান*, ১ম প্রকাশ ১৯৬৯, ২য় প্রকাশ ১৯৭৮, প্রকাশক, মহিউদ্দীন আহমদ আহমদ, পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
৫৫. মুহম্মদ বরকতউল্লাহ্, *হযরত উসমান*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।
৫৬. প্রাগুক্ত, '*লেখকের নিবেদন*'।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫-২১৬
৫৮. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাষা শিল্পী বরকতুল্লাহ্, *মাসিক পূর্বাচল*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২, সম্পাদক, মহিউদ্দীন আহমদ, ঢাকা, পৃ. ৬
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৬১. প্রাগুক্ত,
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩